বাংলাদেশের কবিতায় আত্মস্বরূপ

মাসুদুজ্জামান

কবিসত্তাকে ধারণ করে যে জাগৃতি, অনপনেয় সেই সচেতনতা হচ্ছে অহংবোধ। হোর্হে লুই বোর্হেস তাই সহজেই বলতে পারেন নিজেকেই নিজের লেখায় প্রতিধ্বনিত করে চলেছিলেন তিনি। পরিভ্রমণও ঘটেছে স্বনিকেত লেখমালায়।[১] স্বৈরবৃত্ততা এবং সেই বলয় ভেঙে কবিসত্তার জায়মান হয়ে ওঠার কথা এলিয়টও একদা শুনিয়েছিলেন আমাদের[২]। একথা আজ বহুবিদিত যে গীতিকবিতার নির্ণায়ক শক্তি, সেই প্রাথমিক পর্ব থেকেই, এই তন্নিষ্ঠতা। স্বকীয় মুদ্রা ও স্বচিহ্নিত হবার গরজে মধুসূদন মধ্যযুগীয় সম্মেলক কাব্যরীতিকে অগ্রাহ্য করে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব প্রস্বর। রবীন্দ্রনাথও স্বস্তি পান নি বিহারীলালের মেদুর কবিতার আবর্তনে। আত্মজাগৃতির প্রদক্ষিণময়তায় তাই তাঁর কবিতা বহুবর্ণিল, বিচিত্র। জীবনানন্দ দাশও চেয়েছিলেন স্বকীয়তার বৌধায়ন। রবীন্দ্রভাষিত নান্দনিক প্রশান্তিকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়সংবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজস্ব স্বরায়নের গরিমায় থেকেছেন অন্বেষাচঞ্চল। প্রাচীন কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার পার্থক্য মূলত এভাবেই ঘটে যায়। আধুনিক কবিতা তাই সহজেই বলা যায়, এই ব্যক্তিময় বিশেষ জীবনচর্যার সংকেতলেখ। বাংলাদেশের চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত কবিদের রচনায় এই উন্মোচন কিভাবে দ্যোতনা পেয়েছে সেই অনুসন্ধানে বৃত হবার পূর্বে আরো কিছু পর্যবেক্ষণ জরুরি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিপর্যয়ের সূত্রপাত। রাজনৈতিক স্বাধিকারচর্চার উগ্র নখরে দু'দুবার আক্রান্ত হয়েছে পৃথিবী। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মনোজাগতিক বিপর্যাস, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে দ্রোহ, যুদ্ধবিমূঢ় যুথজনতার তীব্র শোচনা—বিশ্বাবর্তের প্রতিটি আলোড়নে ভেঙে পড়েছে মানবের বহুবর্ষ ধরে গড়ে ওঠা শরণকেন্দ্র। শোপেনহাওয়ারই জানিয়েছিলেন প্রথম, জীবন অসম্ভবের (absurd) ওপর দাঁড়িয়ে আছে।[৩]

তবু তাঁর নির্ধারণ, একক ব্যক্তিমানুষ মানবিক বোধেরই উৎসারণ। কিয়ের্কেগার্ড আরো একধাপ এগিয়ে অন্তর্সত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে জানালেন, যুথজনতার সঙ্গে ব্যক্তির যোগ অবান্তর।[৪] ডিলথে ইতিহাসস্রোত এবং বার্গসঁ 'জীবনস্রোতে'র অনুভাবনার মধ্য দিয়ে আত্মসত্তাকে গরিমা দান করলেও নীৎশে সত্তার ঊর্ধ্বায়নকে ডুবিয়ে দিলেন শূন্যতার (nothingness) গহ্বরে:

> We are told that we have no will, much less free will, and that 'the "subject" is only a fiction'. All that seems to be left is self-interest, underlying all of what we thought were our noblest actions and beliefs. Nietzsche even denies us the right to be egoists, for 'the ego of which one speaks when one censures egoism does not exist at all'. It looks as if the self, which had been raised to transcendental then cosmic status, has now disintegrated into notingness.[৫]

বহির্জাগতিকতার সংঘর্ষে বিশ শতকের শুরুতেই ব্যক্তিস্বভাবের প্রাথমিক আলোড়ন তাই শিকড়িত হয়ে গেল আত্মময়তা ও আত্মরতিতে। হুর্সেল, ফ্রয়েড, ভিটগেনস্টাইন, হাইদেগার, সার্ত্র, কাম্যু, বোভেয়ার, মার্লি-পন্তি সবার ভাবনা-চিন্তন, সত্তার বৌধায়ন, পুনর্সৃজন ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে স্পন্দমান। কিন্তু এই বিবেকী পরিগ্রহণ এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আবার সময়ের যথোচিত অভিভাবে হারিয়ে ফেলে সামগ্রিক উদ্দীপন। আত্মসত্তার যে অস্তিত্বময় পুনর্বসতি ঘটিয়েছিলেন সার্ত্র, সময়ের সঙ্গে যুযুধান সংঘর্ষে আহত উত্তর-আধুনিক ফুকো-দেরিদা-লয়তার্দ-হেবারমাস সেই সত্তাবোধের শেষঘন্টা বাজিয়ে দিলেন তাঁদের রচনাপুঞ্জে। কিন্তু আত্মসত্তা শেষের (end of the self) এই বিভাবন সন্দীপ্ত করতে পারে নি তৃতীয় বিশ্বের ভাবুকদের। সাম্রাজ্যবাদী ছলনাজালের অপাবরণ ঘটিয়ে তাই প্রাচ্যদেশীয় নিশ্চেতন, রিক্ত, রক্তাক্ত যুথজনতার অর্থোদ্ধার করে চলেছেন এডওয়ার্ড ডাব্লিউ সাঈদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, আশিষ নন্দী বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়।[৬]

আত্মস্বরূপের (self) আলেখ্য সমকালীন ধারণাবর্গের সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী বিষয়। নানা প্রসঙ্গের তানবিস্তার থাকলেও সাহিত্যের ভরকেন্দ্রটি এখনো আত্মচিন্তনে স্পৃষ্ট। এই প্রবর্তনা অবশ্য সমকালীন নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতেই

আত্মঅভীপ্সায় জায়মান হয়ে উঠেছিল শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলি। চাঁদ সওদাগর তো আরো পূর্ববর্তী রচনা। জন ডানের রচনাবলি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলতিতেও আত্মস্বরূপের প্রতিসরণ ঘটেছে। কিন্তু মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট বা পদাবলী দুক্ষেত্রেই আত্মসত্তার নির্জিত জৈবতার পাশাপাশি নিক্রমণকেও জাগর রেখেছেন কবিরা। ঈশ্বরিত ঐ বোধে স্বভাবতই আত্মসত্তার নান্দনিক মুক্তির কোন ঝোঁক নেই। কিন্তু রোমান্টিকতার দ্বারা বিভাবিত রবিনসন ক্রুসো বা মাইকেলের সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) ঔদাসীন্য নির্মাণ করে দিয়েছে উত্তর-আধুনিক এষণার পরিপ্রেক্ষিত। রোমান্টিক পর্বেই সমন্বিত আত্মস্বরূপের মানবিক ক্রম-উন্মোচনের সমান্তর স্তরে বিভক্ত সত্তার (divided self) আবর্তটি স্ফুটতর হয়ে ওঠে।[৭] কার্ল মিলারের এই পর্যবেক্ষণ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরো বিশদ হয়ে উঠল। জয়েস, এলিয়ট, পাউন্ডের আত্মস্বরূপের নিরীক্ষা ও যাপনকে আধুনিকতার প্রাথমিক পর্বে উপজীব্য করে তুললেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি। আত্মস্বরূপ বিশ শতকী রচনায় (discourse) বহুমুখিতা (plurality), নানায়তনিক উপাদান (heterogeneity), বিচূর্ণতা (fragmentation), ভাষা-অনিশ্চিতির (language-scepticism) ব্রতকল্পে বলয়িত। এই অভীপ্সাই আত্মস্বরূপকে যে ভিত্তিবিধান দিয়েছে তার বর্গগুলি হয়তো এইভাবে গড়ে নেওয়া যায়: রোমান্টিক উর্ধ্বায়ন, সমন্বিত আত্মস্বরূপের বিচ্যুতি, আত্মস্বরূপের নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য, অবক্ষয়, নির্বেদে নিমজ্জন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় ও উত্থানে আত্মসত্তার জাগৃতি ও বিপর্যাস, আত্মপ্রতারণা, আত্মদ্বন্দ্ব, আত্মসত্তার রূপান্তর, আত্মবিচূর্ণতা, ভাষানিরীক্ষা প্রভৃতি। আত্মসত্তার বোধটি সন্দেহ নেই একারণেই সমসময়ের পরাভব-সংকীর্তন, আত্মপৌরাণিক একমাত্রিকতা, শূন্যতাসন্ধান বা সরল বাকস্পন্দে শুধু প্রস্বরিত নয়, বরং কখনো কখনো উন্মোচনী প্রকল্পনায় স্ফুরিত।

বাংলাদেশের কবিতাতেও এরই স্নায়ব উপস্থিতি ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। চল্লিশের ও পঞ্চাশের কবি আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, আজীজুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ নিজস্ব ব্যক্তিস্বভাব অনুসারে গড়ে নিয়েছেন এক-একটি শুদ্ধশীল বর্গ। আত্মবিস্তারের সেই আয়তনকে ধরবার আগ্রহেই রচিত হয়েছে এই সন্দর্ভ।

২

আধুনিক হয়ে ওঠার সপ্রতিভতায় এই শতাব্দী শুরু হবার পূর্বেই এর দুটো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন হোফমানাস্থাল ঃ জীবনের ব্যাখ্যাবিশদীকরণ ও জীবনবিযুক্তি। অন্তর্জীবনের অনুসূক্ষ্ম উন্মোচনও ছিল তাঁর অভীপ্সা।[৮] এই বীক্ষণ বোঝা যায়, রোমান্টিকতার আশ্লেষ থেকে তখনো পুরোপুরি বিছিন্ন নয়, তবে সময়বিশ্বের অভিকর্ষে নির্মিত হতে চলেছে কবিতার নতুনতর আয়তন।[৯] কিন্তু কি সেই নান্দনিক পরমার্থ, যাকে ফলিত করে দিতে চাইছে এই আয়তন? এজরা পাউন্ড এই পর্যবেক্ষণের সাতাশ বছর পর বিজ্ঞপ্তি দিলেন 'সচেতন বিচ্ছিন্নতার'।[১০] রোমান্টিক ধারাকে আধুনিকতা এইভাবে ঘুরিয়ে দিল আত্মস্বরূপের সতর্ক অলক্ষভাষণের দিকে। এর পর ধীরে ধীরে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে স্বাধিকারসচেতন আত্মপ্রসঙ্গ নানা মাত্রায় বাহিত হয়েছে বিশ্বকবিতায়। বাংলাদেশের কবিতাও অস্পৃষ্ট থাকে নি এই অগ্রসৃতির সংক্রাম থেকে।

একথা আর অজানা নেই যে তিরিশের বাংলা কবিতাই বাংলাদেশের কবিতার পটভূমি রচনা করে দিয়েছে।[১১] কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর বর্জন, পরিগ্রহণের সূত্রে বাংলাদেশের কবিতায় উন্মোচন ঘটে গেছে নতুন দিগ্বলয়ের। চল্লিশের দশকে যার উদ্বোধন, আজ তাই উন্মথিত আত্মসত্তার বিধুনিত পরিক্রমায় উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের কবিতার প্রাথমিক আলোড়ন শিকড়িত হয়ে আছে এই চারজন কবির রচনায়: আবুল হোসেন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব ও সৈয়দ আলী আহসান। ফররুখ আহমদ 'উন্মেষ যুগের ইসলামের',[১২] সঙ্গে আত্মজাগৃতির সামীপ্য টেনেছেন সব সময়। ফলে পুরুষকার ও নিয়তির যে দ্বন্দ্বদ্যোতক রসায়ন, আধুনিক সেই অভিজ্ঞান কখনোই তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। কারণ তিনি পূর্বধার্য সিদ্ধান্তে চালিত থেকে আত্মমুক্তির দেশনায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠলেও অব্যবহিত মূল্যাঙ্কনে স্থির হতে চেয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে অগ্রসৃতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায়। 'চাহার দরবেশ' কাব্যগ্রন্থে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকরণের সামীপ্য ঘটাতে পারেন নি বলে তাই সহজেই এ গ্রন্থটিকে খারিজ করে দেন তিনি। পরবর্তী গ্রন্থ 'অনেক আকাশ'-এ জায়মান হয়ে ওঠে অস্তিত্বের বোধ। তবে আত্মনিরপেক্ষ কোনো বোধ নয়, 'দেহ'কেই 'অস্তিত্বে'র অনির্বাচ্য মহিমা দিয়েছেন তিনি। 'যোনিজ অস্তিত্ব'কে তুলে এনেছেন এই বিশ্বভাবনার মধ্যে। 'নায়িকা এক' কবিতায় কবির এই দেহজ লক্ষ্যের আক্ষরিক ও দার্শনিক পরিচয় সমর্পিত হয়ে আছে:

হৃদয়ে দেহের শোভা, স্নায়ু বিগলিত
পদ্মার প্লাবনে যেন বিচলিত তটভূমি সেই।
... ...
তাই তো পিপাসা নিয়ে দেহ উচ্চকিত
হৃদয়ে রক্ত জ্বলে নিদ্রাহীন রাত্রির সমীপে
তৃষ্ণার্ত মরুর উট যাত্রাশেষে খোঁজে মরুদ্যান
প্রাণের সামীপ্য নিয়ে দেহ যেন সর্ব মূলাধার।

আবুল হোসেনের কবিতাও ব্যক্তিমুদ্রাখচিত, মাধুর্যতির্যক:

আমার স্মৃতির আকাশে দিয়েছে যারা
পাণ্ডুর দিনে মসীময় রাতে রূপালি চাঁদের দীপালি জেলে
সে কুমারীদল লুকালো কোথায় প্রদীপ ফেলে,
কোন্‌খানে আজ তারা?
[নববসন্ত, *নববসন্ত,* পৃ ১৮]

স্নিগ্ধ বর্তিকাবাহিকারা একদা কবির কৃষ্ণরাতকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, কিন্তু আজ তারা অপসৃত। আত্মস্বরূপ তাই প্রশ্নজর্জর, সংকট আসে ঘনিয়ে। অনির্দেশ্য শংকায় নির্জিত হতে থাকে অন্য এক রাত:

সারা রাত কাটিয়েছি অসহ্য আবেগে
এক বিছানায়, কি যেন একটা ভয়
আমার শরীরটাকে কুরে কুরে খায়,
হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলে পিঙ পঙ কারা।
[দুর্যোগ, *নববসন্ত* পৃ ২০]

'অসমাপ্তি' কবিতাটির সূচনা আরো শ্বাসরোধী। সাধুভাষার ঘনত্ব নিঃসার করে দিতে চাইছে কবির আত্মস্বরূপ:

আমাদের মৃত্যুদূত আসিতেছে জানি চুপে চুপে,
সিংহদ্বারে শুনিয়াছি বারবার নিলয় নর্তন।
আমাদের ক্ষীণ আয়ু ক্ষয়ে আসে অন্ধকূপে,
ঝরি ঝরি পড়িতেছে অতীতী বটের ঝুরিগুলো।
[অসমাপ্তি, *নববসন্ত,* পৃ ২৪]

'রূপসী বাংলা'র জীবনানন্দীয় স্মৃতিপ্রতিমা কি এই পংক্তিপুঞ্জ? কিন্তু তাই-বা কি করে হয়। 'রূপসী বাংলা' প্রকাশের আগেই যদিও এই কবিতা লেখা হয়েছিল, তবু

জীবনানন্দীয় ভাষারীতির স্নায়ু-সিক্ত-পীড়িত স্পন্দমায়া নেই এতে। আতঙ্কসঞ্চারী এই সংকটের একাকার চলচ্ছবি অবশ্য খুব স্থায়িত্ব পাবে না। পরবর্তী কবিতার একটি কোলাজচিত্রই এই হন্যমান অবস্থা থেকে কবিকে মুক্তি দেবে:

জাহাজের মাস্তুলে ক্লান্ত সন্ধ্যার আবছায়া মূর্তি,
সমুদ্রের জলে নীরব নিবিড় অন্ধকার,
শূন্যে গোধুলিশেষ আলোর চাপা দীর্ঘশ্বাস।
ব্রিজের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নাবিক।
মনের দূরবীন পেতে রয়েছে সে

[নাবিক, *নববসন্ত*, পৃ ২৫]

বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সত্তাতাত্ত্বিক বিন্যাসই সংশয়জাগর বিবেককে শুভকামনায় প্রাণিত করে। ব্রাউনিং প্যারাডক্সের পরিখা এভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে যান, আবুল হোসেনও পূর্বাচার্যের এই মানবিক আয়তনকে যথাযথ বলে মেনে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়:

পড়ন্ত রোদে চোখ মেলে আজ
দেখি জীবনের বিশাল জাহাজ
ছোট হয়ে আসে। বারে বারে তাই
ভেজানো দরজা শুধু হাতড়াই।
যাবার জন্য প্রাণ উথলানো
(.ই সময়টা থামছে না আর
যখন তখন আসছে আবার।

[বাঁচবো কি, *বিরস সংলাপ*, পৃ ৩৯]

তিরিশস্পৃষ্ট কবিবলয়ের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি স্বচিহ্নিত তিনি আহসান হাবীব। সমীপসময়ের কবিসংঘ শুধু নয়, উত্তরকালের কবিদেরও আচার্য তিনি। আত্মস্বরূপের ইন্দ্রিয়জ প্ররোচনায় তাঁর কবিতা নির্মিত ঠিকই, কিন্তু ভাবাসঙ্গের এই মসৃণ সুরম্য বৃত্তে হারিয়ে যেতে চান নি এই কবি। আসলে নিজের জীবনই সেই আয়ুধ, যার তীব্রগহন শক্তি দিয়ে আহসান হাবীব হয়ে উঠেছিলেন আত্মসত্তার উন্মোচক এক অধীশ্বর:

> গ্রাম জুড়ে অর্থনৈতিক টালমাটাল চলছে। খেটে খাওয়া মানুষ ক্রমান্বয়ে মহাজন হয়ে যাচ্ছে, মহাজন ব্যক্তিরা ছটফট করতে করতে ডুবে যাচ্ছে, এসবের কিছুই সেই কিশোর কবিকে স্পর্শ করছে না। স্বশিক্ষিত একদার ধনী পিতা কোথাও স্থির হয়ে

> বসতে পারছেন না, প্রতি শীতে এখন আর একটি করে নতুন আলপাকার কোট ছেলের গায়ে তুলে দিতে পারছেন না আর...সে নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই ছেলের। সেই সরু রাস্তটির ওপর বসে থাকে ছেলেটি, চারপাশে শেষ বিকেলের মায়া, সামনের দিকে নারকেল শাখায় হালকা আগুন, ফসলতোলা মাঠে ছোট্ট লাফাচ্ছে গলায় ঘুঙুর ছোট্ট বাছুর-ছেলেটি এই বিচিত্র লীলালাবণ্যে অবগাহন করে আর সব ভুলে থাকে। এই ভাবেই শুরু।[১৩]

সপ্রতিভ বাগ্মিতা দিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করেন নি কবি। এতে স্বগত ও পরিপার্শ্বগত যে প্রপন্নার্তি ঝরে পড়েছে, তা থেকে বোঝা যায় উত্তরজীবনে কোথায় এসে দাঁড়াবেন তিনি: 'শ্রেণীবৈষম্যের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা এবং উদ্ভ্রান্ত উদ্বাস্তু যৌবনের যন্ত্রণা এই সবই আজো পর্যন্ত আমার বিষয়বস্তু'।[১৪] আত্মপ্রবর্তনায় তাই আহসান হাবীবের কোনো কবিতাই নিঃশেষিত নয়। সমগ্র অস্তিত্বের সন্নিহিত পাশব উপস্থিতি ও সংহত প্রতিবাদের প্রত্যুত্থানে তাঁর রচনাবলি অভিষিক্ত। চৈতন্য অন্বেষার এই স্বাভিমানকেই সার্ত্র বলেছেন অস্তিত্ব (existence)। অবিদ্যা (bad faith) অতিক্রম করে আহসান হাবীবের আত্মস্বরূপ কিভাবে সার্থক হয়ে (authentic) উঠেছিল, উৎকীর্ণ গদ্যভাষ্যই হচ্ছে সেই অনিঃশেষ আগ্রহের স্বীকারোক্তি। জনচিত্তের মর্মগত প্রজ্ঞানের সঙ্গে অন্তর্নিঃসহায়তার রূপটিও আয়তন দেন তিনি। কিন্তু নিঃসহায়তার পরিতাপময় বিবৃতি শুধু নয়, আত্মশক্তির দিব্যবাণীও শোনান পাঠককে। অনির্ণেয়, পরিত্রাণহীন এক পরিণামের দিকে টেনে নেন তাদের, যা সত্তার জ্যাবদ্ধ টানে একচ্ছত্র। সামাজিক আবর্তের ওপরে কবির এই সশাসন যেভাবে বেজে ওঠে, তাতে আহসান হাবীব হয়ে ওঠেন অপ্রতিম, আধুনিক। ফলে তাঁর ভাববিশ্বের সঙ্গে ভাষাবিশ্বেরও দূরান্বয় ঘটে নি তেমন, আত্মমুদ্রার স্বরসম্মিতিতেই গড়ে উঠেছে কবিতাশরীর। মর্মোচ্চারণের মধ্যবর্তিতায় মাঙ্গলিক উদ্‌যাপন আত্ম-অতিক্রান্তির সংকেতকেই জ্ঞাপন করে:

ক. পোড়া ইট সাজানো বাগান
  দূরে রেখে
এখানে বিশ্রাম করি
  একা বসে
অকৃত্রিম মাটির আসন পেতে।

[যখন বিরতি, *ছায়াহরিণ*, পৃ ৫১]

খ. দেখো না দু'চোখ মেলে
পাথরে পাথর
চতুর্দিকে জমা হয়
বাতাসের চাপ
পাথরে গর্জন তোলে
জ্বলে ওঠে আদিম আগুন।

[হায় নীল পাখির প্রতিমা, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*, পৃ ৩৫]

গ. চৈত্রের খরায় চোখ জ্বলে যায় আবার একদিন, যাক
তবু এই জলপাই পাতার বুকে নাম লিখে রাখো।

[জলপাই পাতার বুকে, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫৫]

ঘ. মোটা লোমশ একখানা হাত তিনি কনুইয়ের ওপর খাড়া করলেন
খরখরে হাতের তালু আমার দিকে ফিরিয়ে ঈষৎ দোলালেন তিনি।
বললেন নেই।

[অপেক্ষা, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৬]

ঙ. আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।

[আমি কোনো আগন্তুক নই, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৭৯]

প্রথম দৃষ্টান্তে খর-প্রতিবেশকে এড়িয়ে কবিসত্তা এগিয়ে গেল মন্দাক্রান্ত সান্দ্র পরিবেশের দিকে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে পরস্পরবিষম পরিবিশ্ব যখন স্নায়ুপীড়নের কারণ হয়ে উঠছে, তখনি আগ্নেয় উৎসবের মধ্যবর্তিতায় ঘটলো আত্মসত্তার উন্মোচন। প্রথম দৃষ্টান্তটিই যেন আবার ফিরে এলো তৃতীয় দৃষ্টান্তে। সেই সমর্পণ, প্রকৃতির মর্মে নিজেকে আয়ত করে দেবার আর্তি। পরবর্তী কাব্যাংশটিতে একটি কর্কশ পরাপ্রাকৃত বাহু কবির সন্দীপনী উন্মোচনকে প্রতিহত করে তাকে যেন শূন্যে

নিক্ষেপ করলো। কিন্তু এই বিবিক্ত প্রতিবেশে কবিসত্তাকে খুব বেশি নির্জিত হতে হয় নি। শেষ দৃষ্টান্তটি আত্মসংরক্ষণের গরজে তাই খুব সহজেই রচনা করেন কবি। নিজেকে শুধু সৌরপ্রকৃতিতে মেলে ধরা নয়, অপরিচয়ের সামান্য আগৌরবেও অনাহত হতে চান না তিনি। এই নিরূপণ 'খোদার কসম' ঐশী গাঢ় স্বরক্ষেপের মধ্যেও উৎকীর্ণ হয়ে আছে। পাঠকমানসের কাছে তখনি কবির নন্দনস্বভাব যে শুধু ব্যক্তিসংস্কারের সঙ্গে জড়িত নয়, ঘটে যায় সেই গ্রন্থিমোচন: 'জীবনের আবিশ্রান্ত প্রবাহে অর্থবহ জীবনসন্ধানে ব্রতী যে ব্যক্তি বা সমাজ, তার পাশে দুর্লক্ষ্য বাতিঘরের নাম কবিতা। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক উচ্চারণের পাশাপাশি শৈল্পিক সজ্জায় সজ্জিত অন্তঃস্রোতের এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকলে মানুষ বারংবার উদ্যম হারাতো'।[১৫]

'মানুষ তার নিজেকেই নির্মাণ করে চলে', জঁ পল সার্ত্রের এই বীজমন্ত্রের সাহায্যেই পঞ্চাশের কবিতার স্বরূপ সমীক্ষণ করা যেতে পারে। এই দশক থেকেই বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার শুরু, উক্তিটির মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও একে অনৃতকথন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু কি সেই নির্ণায়ক বীক্ষণ যা পঞ্চাশের কবিদের যৌথ রচনাবলিকে যুক্ত করে দিয়েছে আধুনিক নন্দনবীক্ষায়? সার্ত্রের উক্তির মধ্যেই আছে সেই প্রযুক্তি। লোকপুরাণের মধ্যে আত্মপুরাণকে সঞ্চারিত করে দিয়েই নিজেদের সত্তাস্বরূপকে পূর্ণায়ত করে তুলেছেন পঞ্চাশের কবিরা। আত্মজৈবনিকতা থেকে কবিতা ঘুরে গেছে লোকমৃত্তিকার কাছে।

'যা পবিত্র তাই ব্যক্তিগত', বুদ্ধদেব বসুর এই মন্ত্রবীজোপম উক্তির আকর্ষণে একদা কবিতাচর্চায় বৃত হয়েছিলেন শামসুর রাহমান। কিন্তু খুব বেশিদিন স্থির থাকতে পারেন নি আত্মব্রতকল্পে, ঘটমান সমকালই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার উদ্দীপন-বিভাব:

> কবিতা বড় গূঢ়াশ্রয়ী, বড় জটিল। আমি তো জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে চাই, কুড়িয়ে আনতে চাই পাতালের কালি, তার সকল রহস্যময়তা। যে মানুষ টানেলের বাসিন্দা, যে মানুষ দুঃখিত, একাকী-সে যেমন আমার সহচর, তেমনি আমি হাঁটি সে সব মানুষের ভিড়ে, যারা ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে তৈরি করে মিছিল।[১৬]

সার্ত্রের বোধিবিদ্ধ উক্তিই যেন পুনরুক্ত হলো এখানে। স্বগত সন্নিধান ও মানবসমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মেরুমৈত্রী এভাবেই রচিত হয়ে গেছে শামসুর

রাহ্‌মানের কবিতায়। কিন্তু পঞ্চাশের প্রাথমিক পর্বে, আগেই বলেছি, তাঁর শিল্পযাপন ছিল আত্মমথিত, অনির্দেশ্য: 'গনগনে চুল্লির আলোর খইয়ের মতো কথা ফোটে/অন্তর্লোকে, রাশি রাশি। আর আমি/তাদের ছড়িয়ে দেই ঢেউয়ের ফেনায়, সপ্তর্ষি মণ্ডলে/পাহাড়ের চূড়ায়, উইঁয়ের টিবিতে, যেখানে খুশি'। (কাব্যতত্ত্ব, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, শ্রেষ্ঠ* কবিতা, পৃ ২৩] রোমান্টিক প্রবর্তনায় উত্তীর্ণ হয়ে যদিও বলেছেন 'সারাক্ষণ অস্তিত্বের ধার/রেখেছি প্রখর তীক্ষ্ণ', তবু এই অভিমুখিতা ততটা প্রাধান্য পায় নি এই পর্বের কবিতায়। সময়ের শোচনা এড়িয়ে তিনি থেকেছেন অনেকটাই দূরে, অনপেক্ষ, অনর্পিত: 'মেঘের বৈভবে সে ফিরে পেলে তার অবলুপ্ত কান্তি,/আর ভেসে চললো আকাশ থেকে আকাশে অক্লান্ত গতিতে/কবির মতো নিঃশঙ্ক, সহজ, একা'। [সেই ঘোড়াটা, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, শ্রেষ্ঠ* কবিতা, পৃ ২৮]

কিন্তু জনবিবক্তি যে কোনো কবির বৃত্তি হতে পারে না, এই শিল্পসংবিৎ ফিরে পেতে খুব বেশি দেরি হয় নি তাঁর। আরদ্ধ অস্মিতা ছেড়ে তাই বিশ্বপরিসরের দিকে এগিয়ে গেছে তাঁর কবিতাপুঞ্জ। একটি সাক্ষাৎকারে পরিবর্তমান রশ্মিজাগর এই আত্মস্বরূপের সঞ্চারপরিধি সম্পর্কে শামসুর রাহ্‌মান নিজেই জানাচ্ছেন: 'ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটা বৈশ্বিক দিকে আমি এগিয়ে গেছি।...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়েও কাজ করেছি, এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি।'[১৭]

এলিয়টের কবিতায় সমসময়কে পরিবর্তিত করে তুলবার অভিপ্রায় লক্ষ্য করে অমিয় চক্রবর্তী যেমন সেই প্রবর্তনাকে 'মানবিক সংকল্প' (human will) বলে উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি শামসুর রাহ্‌মানের কবিতাও সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার সূত্রে বিভিন্ন পর্বাঙ্গে হয়ে উঠেছে পূনর্ণব: 'তৃতীয় বিশ্বের কবিদের অনেক জ্বালা, অনেক বেদনাবোধ, এবং দায়িত্ববোধ আছে। যে-জন্য ক্রমশ আমার কবিতা সেই ভেতরের পৃথিবী থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে গেছে—সামাজিক অনাচার অবিচার এবং স্বৈরশাসন, নানা ধরনের উৎপীড়ন, শৃঙ্খলাবদ্ধতা—এ সবের বিরুদ্ধে আমার মন রিঅ্যাক্ট করেছে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে'।[১৮] সীমঁ দ্য বোভোয়ার স্বাধীনতার প্রামাণিকতা সম্পর্কে দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন: বিশ্বসংযোগ এবং বিশেষ ব্যক্তিক আচরণের মধ্য দিয়েই তা চরিতার্থতা খুঁজে পায়।[১৯] শামসুর রাহ্‌মান এই মন্ত্রণাতেই সত্তাস্বরূপের প্রস্থানভূমি (background) তৈরি করে নিয়েছেন। আর এরই প্রবর্তনায় তৈরি হয়েছে এ রকম কিছু কবিতাংশ:

ক. আমি
রাজস্ব তফতরের করুণ কেরানি, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কত স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।
আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন?
[ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, *নিজ বাসভূমি,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ৬৯]

খ. আমাকে যেতেই হবে যদি, তবে আমি
যীশুর মতন নগ্ন পদে চলে যেতে চাই। অথচ হঠাৎ
একজন তারস্বরে বলে ওঠে, 'নো এক্সিট, শোনো
তোমার মন্তব্য নেই কোনো।' না থাকুক, তবু যাবো
দিব্যি হাত নেড়ে নেড়ে চলে যাবো, কেউ
বাধা দিতে এলে
বিষম শামিয়ে দেবো, লেট মি এলোন, স'রে দাঁড়াও সবাই…
লক্ষ্মী কি অলক্ষ্মী আমি চাই না কিছুই, চাই শুধু যেতে চাই।
[নো এক্সিট, *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ১০৮]

গ. এখনো দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহঙ্কার।
বেজায় টলছে মাথা, পায়ের তলার মাটি সারা দিনমান পলায়নপর,
হা-হা গোরস্তান ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না
আপাতত, তবু ঠিক রয়েছি দাঁড়িয়ে
প্রখর হাওয়ায় মুখ রেখে।
[এক ধরনের অহংকার, *এক ধরনের অহংকার,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ১১০]

ঘ. স্মৃতি বিস্মৃতির ঢোক
গিলে বলি নিজেকেই, নেই, কোথাও কিছু নেই।
ভীষণ বদলে যাচ্ছে দৃশ্যাবলি, হাতের নিকট
হাত এসে কী যে বলে বাউল গানের মতো শুধু।

নীতি, রাজনীতি; রশোমন, রসো মন, কে চম্পট
দিলো কানা গলির ভেতর? ব্লিপ ব্লিপ, রুক্ষ, ধু-ধু
বয়স আমার, নীল ম্যাপ, ট্যাঙ্ক, ককটেল-স্মৃতি।
[পার্টির পরে, *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে,* শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃষ্ঠা ১৪৮]

৬. যে যেমন খুশি যখন তখন বাজাবে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কন্টকময় রক্তপিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিঃশ্বাস।
[ইলেক্‌ট্রার গান, *ইকারুশের আকাশ,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ১৫৪]

উত্তর-আধুনিক নন্দনতত্ত্বে যে বহুচারিতার কথা বলা হয়েছে, প্রথম কবিতায় লোকার্ত হয়ে উঠবার মধ্য দিয়ে পাওয়া গেল তারই উদ্ভাস। প্রতিস্পর্ধী সত্তার সঞ্চরণের মধ্যে সার্ত্রের মতোই সত্তাস্বরূপের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন ইয়েটস;[২০] দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে শামসুর রাহমানের প্রিয় কবি ইয়েটসের এই বিভাবন প্রযুক্ত হয়েছে। 'শুধু যেতে চাই' শব্দবন্ধটি আবার কিছুটা পরিবর্তিত ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হবে শহীদ কাদরীর কবিতায়।[২১] শেষ দৃষ্টান্তে উপস্থাপিত হলো কবির বিচূর্ণ আত্মস্বরূপ, কর্কশ শব্দপুঞ্জ ও ভাষা মন্তাজের রীতিতে যা পেল সুসহ পারম্পর্য। এ কবিতারই অন্য এক পঙ্‌ক্তি: 'হবে কি দেখা কীয়ের্কেগার্ড, নীটশের সাথে?' কবির আত্মসত্তা বোঝা যায়, একায়তনিক নয়, বিপ্রতীপের মেরুমৈত্রী রচনার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল, স্বয়ম্প্রভ।

'পার্সোনাল ধারার অনাবিল উন্নতিতে কাব্যের ভবিষ্যৎ মৃত্যুঞ্জয় হবে', বলেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। বাংলাদেশের কবিতার নন্দনবীক্ষা মূলত নিরূপিত হয়ে উঠেছে তাঁরই হাতে। সেই পঞ্চাশের দশকেই তিনি বুঝেছিলেন, ব্যক্তিমনের দুরবগাহ প্রতিভায় কবিতা খচিত না হলে কবির জীবনদৃষ্টি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে না:

> নিশ্চিতভাবে কাব্যে কবির মনকেই আমরা আস্বাদন করি; তাঁর আবেগ, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর দেখা প্রেম-অপ্রেম, সুন্দর সম্পর্কে রুচি। কবিতার তত্ত্বের ওপর কবির মন আধিপত্য লাভ না করলে কবিতা কবিতাই নয়। মূলত কবি কাব্যে নিজেকেই প্রকাশ করতে চান। 'নিজেকেই' অর্থে নিজের মনোভাবনা বা বিশেষত্বপ্রবণ মনকে, যাকে সামগ্রিক জীবনদৃষ্টিও বলা যেতে পারে।[২২]

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার প্রাণসূত্র প্রধানত তত্ত্বের ওপর কবিমনের এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সচেতন সমন্বয় বলা যেতে পারে। এলিয়টও তর্জনী উঁচিয়ে

এই আত্মসংস্থাপনের কথা বলেছিলেন ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিকতার বর্গ নির্মাণ করে।[২৩] হাসান হাফিজুর রহমান স্বনির্ণীত এই বর্গায়তনের টানেই স্বদেশের পটে বিম্বিত দেখতে চেয়েছেন নিজেকে। আত্মবিশ্লেষণ, অনাত্মতা, অস্তিত্বের উৎসর্জন এসব বিষয়েই পূর্বাপর কেন্দ্রিত থেকেছে তাঁর কবিতা। কয়েকটি উদাহরণ:

ক. মনের অজস্র তীব্র তীক্ষ্ণ তীর
ছুটে যায়, ফিরে আসে, আমাকেই
বিদ্ধ করে অবশেষে, এই নৈরাজ্যের
দেশে আমি ছাড়া আমাকে নেয় না কেউ
[ধ্যানের প্রাচীন পথ ছেড়ে, *বিমুখ প্রান্তর,* পৃ ৪৫]

খ. এই তো দিলাম মেলে হাত দুটো সামনে তোমার
সাদা দুটো তালু, নেই কিছু সেখানে আর।
হৃদয়ের রক্তে শুধু প্রজাপতি আঁকা
দূরে উড়ে যাবে বলে মেলে আছে পাখা।
[বিষণ্ন শ্যামলী, *আর্ত শব্দাবলী,* পৃ ২৭]

গ. বজ্রে চেঁরা আঁধার আমার
কেবল আঁকে
পথের রেখা
সারা রাতের বাঁকে
[*বজ্রে চেরা আঁধার আমার,* পৃ ৯]

ঘ. পর্বতের
সুতীব্র খাড়ার বুক ঘিরে পত পত করে-ওড়া অকাতর দুঃসাহসী,
অনাঘ্রাত অসীমের গাঢ়-রঙ কেড়ে ফেরা, তুমি পাখি,
এত শীঘ্র গেলে ভুলে আজীবন উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সুর,
অবাধ অনাদি পাখি, পাখি, পাখি তুমি?
[পাখি তুমি, *বজ্রে চেঁরা আঁধার আমার,* পৃ ২৭]

ঙ. স্বপ্ন শব্দ প্রাণ
তিনের তুড়িতে
নূড়ির পর নুড়িতে
ঝর্ণাতলার গান
অশেষ জলতলায় এস
দেব স্রোতো বীজ

স্বপ্ন দিয়ে শব্দ মুছি
প্রাণ দিয়ে শব্দ মুছি
ভাও করে উঠছে বুঝি ভালোবাসার শুচি

চ. একদা মৌমাছিরা এসেছিল, গেয়েছিল গান
একের সুধা অন্যে ঢেলে জাগিয়ে তুলে প্রাণ।
আজকে গেছে বনান্তরে,
অন্য কিছুর অন্তরে,
তেমনি করে গাইছে তারা, তেমনি রকম ধ্যান।
আমি আকুল বসে থাকি প্রতীক্ষা সজ্ঞান।

[*হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা,* পৃ ৩৯]

হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় আয়ত শিল্পএষণার স্তরসংকুল আত্ম-উন্মোচন কীর্ণ হয়ে আছে এই সব উদাহরণে। আত্মসত্তা (self) ও প্রতিসত্তার (anti-self) ক্রমাগত বিনির্মাণ ছাড়া প্রগতি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন ইয়েটস।[২৪] প্রথম দৃষ্টাতে এই আত্মবিভক্ত সত্তারই সংকটভাষ্য পাওয়া গেল। প্রতীকায়িত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি প্রস্বরবিক্ষেপে গভীর। শাদা বর্ণের পটে রক্ত-আঁকা প্রজাপতি কবির স্বপ্ন-প্রতীক, উড্ডীয়মান। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি আরো তাৎপর্যবাহী, আঁধার বিপ্রতীপের সামীপ্যে আঁকা হলো পথের রেখা-উদ্দীপনবিভাব। জাগর চৈতন্যই খুলে দিতে পারে উন্মোচনী দৃষ্টি। চতুর্থ দৃষ্টান্তের প্রশ্নার্তির মধ্যে রয়ে গেছে সেই ব্যপ্তিবাচক বীক্ষণ। প্রশ্নটি শেষ হয় নি, প্রত্যুত্তর তো নেই-ই। খুবই নাটকীয় অথচ আধুনিক এই ভাষা-প্রকল্পনা। শেষ দুটি দৃষ্টান্ত আবেগেরবর্ণালিসম্পাতে আরো উজ্জ্বল। আর সন্দেহ থাকে না এই ধরনের বোধিদীপ্ত উচ্চারণেই এসে ভর করে কবির বক্তব্য-নির্যাস। ব্যক্তিজীবন ও শিল্প এরকম তন্ময় মুহূর্তেই হয়ে ওঠে অবিভাজ্য, সংরক্ত অথচ অপীড়িত বোধে উন্মীলিত। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা আসলে সায়াহ্ন পর্বে সত্তাসংকটে স্নায়ব ও জটিল হয়ে পড়েছে। যদিও এই পর্বের রচনা বহুলায়তনিক লক্ষণে সন্নিহিত তবু সময়ের সংশ্লেষে তা যেন নিয়তিবেষ্টিত, আগ্নেয়; কিন্তু সার্বিক নির্বাণ নেই। বিভক্ত, নির্জিত আত্মসত্তার সমীকরণ চাইছেন তিনি, কিন্তু দৈশিক সংকটের কারণে অন্বয় ঘটছে না কিছুতেই। আর এজন্যে অধিকাংশ কবিতায় তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নে আত্মজর্জর, রক্তাক্ত। যেন শান্তিস্বস্ত্যয়নের শেষ সম্ভাবনাও আজ বিলুপ্ত।

পঞ্চাশ দশকের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত অন্য এক প্রধান কবি আল মাহমুদও সর্বমুখী আত্মজাগৃতির জাতক। তাঁর কবিতাও পূর্ণায়ত আত্মঅভিব্যক্তি, নিজস্ব চরিতমানসের অভিক্ষেপে অপ্রহত। গ্রন্থবদ্ধ প্রথম কবিতাতেই তাঁর ঘোষণা: 'ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে/আমাকে পশুর মতো মনে হতে থাকে। ধূসর হাওয়ায়/পাশব কেশর ওড়ে, অনাচারী বিষয়ী নখর/নষ্ট করে গাছ পাতা নারী শিশু জনতা শহর'। [বিষয়ী দর্পণে আমি, *লোক লোকান্তর,* পৃ ১৯]। বোঝা যায় এ হচ্ছে নিজেকেই ঘুরিয়ে দেখার অন্য এক দর্পণ। সরল স্বীকারোক্তি দিয়ে যখন আত্ম-উন্মোচন ঘটে না, তখনি বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে মেলে ধরতে হয় নিজেকে:

আসলে তো আত্মাই সব
ঘুরে ফিরে কোনো গতি নেই
একদিন ফিরে যেতে হয়
অবশেষে নিজের দিকেই।
[নিজের দিকে, *লোক লোকান্তর,* আল মাহমুদের কবিতা, পৃ ৫৫]

মার্লো-পন্তিও বলেছিলেন, সত্তার পূর্ববাহিত কোনো 'আমি' নেই। অন্য সত্তার সঙ্গে 'আমি'র সংযোগ-বিভাজন কখনোই ঘটতে পারেনা।[২৫] আল মাহমুদের কবিতাও এই অস্মিতায় অর্পিত, আত্মসত্তা ও বহির্সত্তা পরস্পর সংসক্ত:

ক. কতদূর এগোলো মানুষ।
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজো উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
[প্রকৃতি, *সোনালি কাবিন,* আল মাহমুদের কবিতা, পৃ ১১৯]

খ. পলাতক বলে লোকে, বুকে বড়ো বাজে। আমি তো এখনো
জীবনের জলাধারে হতে চাই তুমুল রোহিত।
কোথায় পালাবো আমি, যেখানে রাতেও
নারীর নিঃশ্বাস এসে চোখে মুখে লাগে। বুকে লেগে থাকে ক্লান্ত
শিশুর শরীর, বলো,
পালাবো কোথায়?
জীবনের পক্ষে তাই সারাদিন দরজা ধরে থাকি।
[পলাতক, *সোনালি কাবিন,* আল মাহমুদের কবিতা, পৃ ১২৯]

নিজেই জানাচ্ছেন: 'প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে আমার ভালো লাগতো। যেমন ভাবতাম, পুরুষ অর্থাৎ কবির কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর দৃশ্যমান জগতে আর কি আছে? আর কি কি আছে খুঁজতে খুঁজতে আমি সারা নিসর্গমণ্ডলকেই এলোমেলো করে ফেলেছি।'[২৬] কিন্তু এই প্রতীতিযোগ্যতা শেষ পর্বে ঐশী তত্ত্বনির্মিতির গরজে নিজেই বর্জন করলেন আল মাহমুদ। তাঁর সাম্প্রত এই বোধ অপার্থিব, মিস্টিক-মনস্ক: 'জাগতিক সব সৌন্দর্যবোধই শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর।... যে সব অপরূপ উপত্যকায় কবি বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন সেখানে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিমালা বর্ণ ও তেজ হারিয়ে নিভে যায়।'[২৭] নিরঞ্জন এই ধারণাতেই পরাপ্রাকৃতের দিকে এগিয়ে এসেছেন আল মাহমুদ, যেখানে ঐশ্বরিকতাই প্রধানতম শর্ত। এরই প্রাণনায় রচিত হয়েছে *মায়াবী পর্দা দুলো ওঠো* থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী কবিতা। কিন্তু আল মাহমুদের পরিবর্তিত শিল্পনির্দেশণা কি তার নিজেরই পূর্বজ কবিতাবলিকে খারিজ করে দেয় না: 'আমি মনে করি কবি হিসেবে আমার এই বিশ্বাসই আমার সার্থকতা।'[২৮] অর্থাৎ তাঁর অন্য কবিতাগুলি তাহলে আসার্থক? প্রশ্ন জাগে কেন তাঁর এই ভ্রান্ত ঈপ্সা! পার্থিব-অপার্থিব দ্বৈরথের মুখোমুখি হয়েও তো আত্মস্বরূপকে মুক্তি দিতে পারতেন এই শক্তিশালী কবি।

দ্বিধাদীর্ণ আত্মস্বরূপের সমীকরণ পরস্পরবিষমতার মধ্য দিয়েও তুলে ধরতে পেরেছেন পঞ্চাশেরই অন্য এক কবি সৈয়দ শামসুল হক। শামসুর রাহমানের মতো তাঁর কবিতাও ব্যক্তিক সংবেদনা থেকে বিশ্বাবর্তের আসঙ্গে ক্রমবিজড়িত হয়ে পড়েছে। প্রথম দিকের অন্তর্গূঢ় ভাষাশৈলী উত্তরপর্বে তাই বৃহৎ জীবনচর্যার জটিল দূরান্বয়, তন্ময় সংবেদে নির্যাসনিবিড়। তাঁর প্রসঙ্গ-অভীপ্সাও ব্যক্তিক প্রেম, অপ্রাপ্তিজনিত বিকলনকে এড়িয়ে গিয়ে 'বহির্জাগতিক বিশ্বময়তার নিখিলভাষ্যে সন্দীপ্ত:

> আমাদের দীর্ঘযাত্রায় —সমষ্টির ও ব্যক্তির—জীবনবোধ বদলেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না; এই জীবনবোধের অন্তর্গত-জীবনকে মূল্যবান বলে বিশ্বাস করা, অপরের প্রতি চক্ষুষ্মান হওয়া—বিদায় কি স্বাগতম, পরাজয় কি জয়, যুক্ত কি বিযুক্ত প্রতিটি মুহূর্তেই আশা ও বিস্ময়কে ত্যাগ না করা এবং সমস্ত কিছুর ভেতরে যে নন্দন-জ্যামিতি রয়েছে তা উপলব্ধি করা—আমাদের জীবনে অনবরত যে যুদ্ধ চলছে—সাম্যের কি সৌন্দর্যের—সেই যুদ্ধটিকে আপনার যুদ্ধ বলে অনুভব করা।[২৯]

ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতি এই অভিমুখিতা নতুন কিছু নয়, কিন্তু রোলাঁ বার্থ থাকে বলেন 'স্বপ্ন এবং সন্ত্রাস', 'শরীরি ও দুরবগাহ ভাষা'[৩০] সৈয়দ হকের কবিতা সেই আলেখ্যেরই ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছে। বার্থের মতো এই কবিও তাই মনে করেন আঙ্গিকের মাধ্যমেই বিষয়ের বিততবয়ন ও নিরীক্ষণ সার্থকতা পায়ঃ

> বিষয় যদিও প্রকরণের সমতুল্য সব অর্থে–কিন্তু বিষয়ের উদ্ভাবন সম্ভব বা বিষয়ের জন্যে অপরের রচনার পরিচয় প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না, কারণ বিষয়ের চেয়ে সহজলভ্য এবং প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত আর কিছু নয়। যখন আমরা বলি তাঁর কবিতায় নতুন 'বিষয়' এসেছে, আসলে আমরা বিষয়ের নতুনত্ব নয়, বিষয়টির নতুন প্রয়োগের কথাই বলি... ।[৩১]

বিষ্ণু দে-ও একবার বলেছিলেন সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে 'টেকনিকের ইতিহাস'। কিন্তু 'সাধারণের জীবনেই' তিনি খুঁজে পেয়েছেন এর উৎস। টেকনিককে খারিজ না করেও তাই তিনি জনসম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। গণমুক্তির ইশারায় অপ্রতিম হয়ে উঠেছে তাঁর যাপন। সৈয়দ হকের কবিতাও সেই অর্থে শুধুমাত্র হৃদয়সংবাদী একক সমাচারে নিঃশেষিত নয়; মনোজাগতিক আত্মসংকট থেকে দেশচেতনা এবং দেশচেতনা থেকে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষণীতে তা প্রদক্ষিণমুখী, শিল্পজাগর। স্বগতের মধ্যেই বিশ্বগতের শিল্পবয়ন ঘটিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। কয়েকটি উদাহরণ:

ক. তুলনা নেই তার রমণীকুলে
অনিন্দিত তার ক্ষুদ্র দেহ
যেন তা একমুঠো করতে পারি
দারুণ বিকারের অন্ধকারে।
[না নির্বোধ, না মহাপুরুষ, *একদা এক রাজ্যে,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ৪৫]

খ. আমাকে বেরুতে হবে, ইতিমধ্যে যেন যুগ গেছে,
খুলে দিতে হবে রঙিন রুমাল, চুল, আনতে হবে
ফেরারী ঘোড়ার পাল--কেশরের সুগন্ধ যার, যার পিঠে
যাত্রা ছিল একদা আমার।
[কবিতা ২৪০, একদা এক রাজ্যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৩১]

গ. হে জননী
তোমার মুখ যখন দুঃসহ কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে
আমার আত্মা হয়েছে অগ্নিপুষ্পের স্তবক;

তোমার শরীর থেকে যখন রক্তপাত হচ্ছে
আমি সহস্রের হাতে সমর্পণ করেছি
আমার অস্থির আঙুল
[একটি গাথার সূচনা ও মৃত্যু, *বিরতিহীন উৎসব,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ৬৭]

ঘ. এশিয়ার ধানখেতের ভেতর দিয়ে
পূর্ণিমার কাননঘেরা বিদ্যালয়ের দিকে যেতাম
সেই ধানখেতের ভেতর দিয়েই আমি আজ
অমাবস্যায় আগুনঘেরা বসতির দিকে যাই।
[রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা, *অপর পুরুষ,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ১৩৭]

ঙ. আহ্ চুপ। আমাকে শুনতে দাও
মাটির ওপর দিয়ে, ঘাসের ওপর দিয়ে, শব্দহীন সেই শব্দ–
কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ হেঁটে যাচ্ছে, কেউ কারো সঙ্গে
যাচ্ছে, একজন আরেকজনের সঙ্গে যাচ্ছে।
[আমাকে শুনতে দাও, *নিজস্ব বিষয়,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ১৯৫]

চ. বস্তুত মানুষই নিক্রান্ত হলে পড়ে থাকে
কাননে কিছু কবর,
করোটিতে ছিদ্র,
সম্মোহনে চিৎকার,
এবং রাষ্ট্রের মাংসখণ্ডে দেহহীন দাঁতের করাত।
[না হেনা, কোনো ইন্দ্রজাল নয়, *নিজস্ব বিষয়,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ২৩৫]

সৈয়দ হক প্রাথমিক পর্বে যে ফ্রয়েডীয় শরীরচেতনার সূত্রধার ছিলেন, প্রথম দৃষ্টান্তে রয়েছে আবেগের সেই গূঢ় সন্নিবেশ। ব্যক্তিক এই ভাবনা থেকে কিভাবে বিশ্বদেশের দিকে ঘুরে গেলেন, পরবর্তী পাঁচটি দৃষ্টান্তে সেই গতিভঙ্গিটিই প্রবর্তনা পেল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আত্মরতি থেকে নিক্রমণের আর্তি, তৃতীয় দৃষ্টান্তে মাতৃপ্রতিমার মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি ব্যক্ত হলো আত্মসমর্পণের সংবাদ। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের একজন নাগরিক হিসেবে খুব সহজ ছিলনা এই নিবেদন; চতুর্থ দৃষ্টান্তে, তাই অগ্নিঘেরা বসতির দিকে তাঁর অনিবার্য যাত্রা। এই যাত্রাই আরো প্রস্বরঘনিম হয়ে উঠছে মৃত্তিকামানুষের সমবেত পদবিক্ষেপের সঙ্গে সংযোগসূত্রে, পঞ্চম দৃষ্টান্তে। আসলে মানুষই যে শেষবিচারে শিল্পের প্রকৃত উপপাদ্য, এই ভাবার্পনের মধ্যবর্তিতায় পূর্ণায়ত হলো সৈয়দ হকের নন্দনচিন্তা, সর্বশেষ দৃষ্টান্তে।

পঞ্চাশের তিন কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও আজীজুল হকের কবিতাও চারিত্রের দিক থেকে বিপ্রতীপ বোধে আবর্তিত, আত্ম-অনুভূত অভিজ্ঞতায় একইভাবে প্রস্বরঘনিম। অন্তর্নিঃসহায় আত্মজীবন এবং পরাভবহীন সমষ্টিজীবন–এ দুয়ের স্থাপনা ও স্ফূর্তি খুঁজে পাওয়া যাবে এই তিন কবির অসংখ্য লেখায়। পার্থক্য হলো এই যে, নারীশরীরের প্রদর্শনপনা ও সংরাগে যেখানে আত্মমুক্তি ঘটে ফজল শাহাবুদ্দীনের, সেখানে আজীজুল হকের কবিতা প্রতিস্পর্ধী অভিজ্ঞতায় ও বহুকৌণিক তাৎপর্যে তীক্ষ্ণ, আত্মদীর্ণ। দ্বন্দ্বদ্যোতক প্রতিমুখী দুটি দৃষ্টান্ত:

ক. আমার আত্মায় আছে আন্দোলিত অসংখ্য শরীর
শরীরে শরীরে শুধু উন্মথিত আত্মার ক্রন্দন
দেহজ আত্মায় শুনি ধ্বনি সেই প্রাচীন বৃষ্টির
রক্তের চৈতন্যে নামে ধ্যানমগ্ন ক্ষুধার্ত স্পন্দন
রক্তের শরীর আছে, আছে ক্লান্ত দৃষ্টির শরীর
প্রেমের শরীর আছে, আছে মুগ্ধ স্পর্শের শরীর
রমনে শরীর এক দীপ্ত হয় ঈশ্বরের হাতে
মগ্নতা শরীর হয়ে ব্যাপ্ত হয় সন্ধ্যা ও প্রভাতে
[দেহজ চৈতন্যে, *আলোহীন অন্ধকারহীন*, পৃ ৩৬]

খ. শয়তান আমাকে নেবে না,
　　　　এবং যাজক
আমাকে দিয়েছে ঠেলে দূরে,
　　　　এবং সে নারী
আমাকে বিষাক্ত জেনে অসহ্য অকথ্য কোনো দুঃখে
চকিতে শাড়ীর খাপ ছুঁড়ে ফেলে ধারালো ফলায়
বিঁধে আছে প্রণয়ীর বুকে।
[শবাধারে রাত, *ঝিনুক মুহূর্তে সূর্যকে*, পৃ ২০]

প্রথম কবিতাংশটিতে শরীরী সংবেদের গড্ডলস্রোতে ভাবোদ্বেল আতুরতা থেকে মুক্ত, আত্মসমীক্ষণে বিশেষিত। আসলে আজীজুল হকের আত্মস্বরূপ দ্বন্দ্বরক্তিম, প্রশ্নায়নে গড়ে নিতে চায় আত্ম-উৎক্রান্তির পারমার্থিক দিগ্বলয়:

উজ্জ্বল আলোর কাছে প্রতিশ্রুতি তুমি কেন সরে যাচ্ছো ক্রমে
অন্ধকারে? আর কোনো অবশিষ্ট বিপন্নতাবোধে
সম্প্রতি আক্রান্ত তুমি?
　　　　　　কিংবা কোনো দুরারোগ্য চিহ্নহীনতায়

নিজেরি ছায়ায় বৃথা নিরাপত্তা খোঁজো,
কেবলি নিরস্ত্র হও, তুমি
খুলে ফেলে দাও শার্ট হাতঘড়ি জুতো
কম্পাসের নীল কাঁটা, ক্রমে
ঘাতকের ঠাণ্ডা হাতে জমা দাও অস্থিরতা ক্ষিপ্রতাকে, দাও
আদিম আকাঙ্ক্ষা সব অট্টহাসি নিপুণ চিৎকার?
[বিপরীত বিশুদ্ধতা, *ঘুম ও সোনালি ঈগল,* পৃ ৯]

প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ *সাতনরী হার* -এ ছড়ার আঙ্গিকে আত্মস্বরূপকে স্বচ্ছন্দ ব্রত ও বিহারে উপজীব্য করে তুলেছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। কিন্তু ধীরে ধীরে এই নম্র নিরূপিত ছন্দস্পন্দগুণ ছেড়ে তাঁর কবিতা আজীজুল হকের মতোই স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে হয়ে উঠেছে ঋজু, গতিময় ও স্রোতগ। *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* থকে যুক্ত হতে থাকে গ্রথিত আত্ম-অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাণময় মনস্বিতা, ইতিহাস অভিজ্ঞান, নৃতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ। এই আরতি তাঁর *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* ও *আমার সময়* কাব্যগ্রন্থেও অনুস্যূত হয়ে আছে। একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত:

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের
ঊর্ধ্বমুখী অহংকারের কথা বলছি,
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।
শৃঙ্খলিত বৃক্ষের ঊর্ধ্বমুখী অহংকার কবিতা
আদিবাস অরণ্যের অনার্য সংহতি কবিতা।
[আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি,* শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ ২০৪]

ইয়েটসই বলেছিলেন, এই পৃথিবী যে শুধু বিচূর্ণ বোধের সমষ্টি তাই নয়, আত্মস্বরূপ আত্ম (self) ও অনাত্ম (anti-self) বোধে দ্বিধারক্তিম। আর এই অনাত্ম অহংই পারে আত্মস্বরূপকে অনুভববেদ্য করে তুলতে:

> If we connot imagine ourselves as different from what we are, and try to, assume the second self, we connot impose a discipline upon ourselves though we may accept one from others.[৩২]

বাংলাদেশের কবিতাও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের রচনাসূত্রে অর্জন করে নিয়েছে এই আত্মসামগ্র্য, যাথোচিত সংবেদ। কেননা ইয়েটসেরই মতো আমাদের এই কবিও জানতেন: 'একমাত্রিক কিছু নয়/স্বপ্নের অনেক মাত্রা/ অস্তিত্বের বিপুল বিস্তার/স্মৃতি নানা মনিবর্ণে জ্বলে/সত্যের বিচিত্র পত্র/বহুমাত্রা জীবনের গানে [চতুর্মাত্রায় যাই, *ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার,* পৃ ২২] কবিতাতেও আছে তাঁর নানা প্রবর্তনা:

ক. স্মৃতির বয়স কত! তার শয্যা আজ তীর্থভূমি।
শুভ্রদেহে চাঁদ মেখে প্রত্যাশিত দুরন্ত নেশায়
সিঁড়ির ওপার হ'তে তবুও সে বলবেনা: তোমার আশায়
কতকাল থাকি বলো, এবার আমাকে নাও তুমি।
শুধু এই হু-হু শূন্যে তার স্নিগ্ধ হাসি শোনা যায়।
স্মৃতির হৃদয় মৃত, ভারাক্রান্ত গানের মৌসুমী।
[*স্মৃতির স্বর্গ*, *দুর্লভ দিন,* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্য সংগ্রহ, পৃ ৩৩]

খ. পথ হারাতে চেষ্টা করে ভুল বাঁকে যাই
অজানা এক পথে হাঁটি। অচেনা এক বাড়ির সদর
দরজা পেয়ে কড়া নাড়ি, ঘন্টা বাজাই। দরজা খোলে
এক ইঞ্চি। আমি বলি: 'হারিয়ে গেছি, ভীষণভাবে'।
অচেনা স্বর কিছু বলে ভিন্ন ভাষায়।
কী আনন্দ! এলাম বুঝি অবশেষে
অচেনা তার অজানিতের দুয়ার প্রান্তে। হারিয়ে গেছি।
ঠিক তখনই সামনে এসে গাড়ি থামে
পরিচিত কণ্ঠ বলে, 'দাঁড়াও', 'শোনা',
'ঐ তো', 'ঐ যে', 'পাওয়া গেছে'।
খুঁজে ওরা ঠিক পেয়েছে আমায়।
[এই শহরে, *ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার,* পৃ ২৭]

প্রথম কবিতাংশে যেন ঘটলো আত্মস্বরূপের হাইদেগারীয় উন্মোচন (uncovering) ও নিষ্ক্রমণ, বিপ্রতীপের সংঘর্ষে যা জ্বলে উঠেছিল ইয়েটসেরই

কবিতায়: 'প্রেমে পড়েছে মানুষ এবং সেই প্রেম অপসৃত' [উনিশশ উনিশ]। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও আত্মস্বরূপের সংঘর্ষসংকুল চলায় উন্মথিত। কবিতাটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বেকেটের সত্তার সতর্কনির্মাণ সংক্রান্ত সেই মনোনাট্যে (psychodrama) লক্ষণাক্রান্ত উক্তি:

> I Hope this preamble will soon come to an end and the statement begin that will dispose of me. Unfortunately I am afraid, as always, of going on. For to go on means going from here, means finding me, losing me, vanishing and beginning again, a stranger first, then little by little the same as always, in another place, where I shall say I have always been, of which I shall know nothing....[৩২]

কিন্তু বেকেটের মতো নিহিলবাদী শূন্যাত্মক সত্তাসংক্ষোভ নয়, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা আত্মগত এবং বিশ্বগত বোধে সমীকৃত। স্বতঃসিদ্ধ প্রাণাবেগ ও বিবেচিত দেশবোধে অস্মিতাকে উৎসর্জন দিয়ে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন মানবমুক্তির শরণপতাকা:

> আবার বুকের রক্তে বাংলার শ্যামল প্লাবিত,
> যেন কোন সবুজাভা নেই, আর, সকল সবুজে
> ছোপ ছোপ লাল রক্ত, আর সেই
> সবুজের বক্ষদীর্ণ রক্তের গোলকে
> সোনার বাংলার ছবি
> মুহূর্তে পতাকা হয়ে দোদুল বাতাসে
> [জর্ণাল ১: তেইশ মার্চ ১৯৭১, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্য সংগ্রহ, পৃ ১৬৪]

আর এভাবেই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা হয়ে উঠেছে আধুনিক, পশ্চিমী আধুনিকতার সঙ্গে এর যোগযুক্ততা খুঁজতে যাওয়া অবশ্য অবান্তর।

তথ্যনির্দেশ

১ Preface to The Gold of the Tigers, *The Book of Sand*, Jorge Luis Borges, Penguin Books Ltd., London, 1979, p.98

২ দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ Tradition and the Individual Talent, T. S. Eliot, *Selected Prose*, Penguin Books Ltd., Middlesex, reprinted 1965, pp. 21-30

৩ The Self Turned Sour: Schopenhauer, *The Rise and Fall of the Self*, Robert C. Solomon, Oxford University Press, 1988, p 76

৪ After Hegel, Kierkegard, Feuerbach, Marx, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯০-৯১

৫ The Attack on the Self: Nietzsche and Nihilism, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৬ দ্রষ্টব্য এ সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ: এডওয়ার্ড সাঈদের লেখা ১. *Orientalism*, Peugnin Books, London. 1991; 2. *Culture and Imperialism*, Alfred A. Knopf, New York, 1993; গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের *In Other Worlds, Matthen*, New York, 1987; হোমি ভাবা সম্পাদিত *Nation and Narration*, Routledge, London, 1990; নুইগী ভা থিয়োঙ্গোর *Decolonising the Mind*, James Currey Ltd; London, 1986; আশিষ নন্দীর ১. *The Intimate Enemy*, Oxford Univercity Press, Delhi, 1991, 2. *Traditions, Tyrany and Utopias*, Oxford University Press, Delhi, 1992; পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* Zed Books, London, 1986; সারা সুলেরীর *The Rhetoric of English India*, The University of Chicago Press, Chicago, 1992 ইত্যাদি।

৭ *The Modernist Self*, Dennis Brown, Macmillan Press, Hampshire, p. 4

৮ The Mind of Modernism. *Modernism*, Penguin Books, Middlesex, p. 71

৯ The Name and Nature of Modernism, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-৫৫

১০ *Mauberly*, Selected Poems, T. S. Eliot (edt.), Faber and Faber London, Fifth impression, 1968, P.183

১১ তিরিশের কবিতা উন্মোচনে সহায়ক উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক প্রকাশনা ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের *আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫; মাহবুব সাদিকের *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১; সিদ্দিকা মাহমুদার *সুধীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২; মাসুদুজ্জামানের *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩; বেগম আকতার কামালের *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ ইত্যাদি।

১২ *ফররুখ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদনা), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ ৩৯৫

১৩ পরিক্রম এবং অবস্থান প্রসঙ্গ, *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ*, আহসান হাবীব, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৃ ৯

১৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৩

১৫ আত্মবিবৃতি, *স্বনির্বাচিত*, আহসান হাবীব, *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা: তুলনামূলক ধারা* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৭৬

১৬ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৯

১৭ শামসুর রাহমানের মুখোমুখি হুমায়ুন আজাদ, 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা', শামসুর রাহমান সংখ্যা, ১৯৯১, পৃ ১০৮

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯

১৯ The Self in France: Sartre, Camus, de Beauvoir. Merleau-Ponty, *The Rise and the Fall of the Self*, Rober C. Solomon, Oxford University Press, Oxford, 1944, p. 173

২০ *The Modernist Self*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯

২১ দ্রষ্টব্য 'কেন যেতে চাই' কবিতাটি, *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১১৭

২২ *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৪৯

২৩ দ্রষ্টব্য Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধটি।

২৪ *The Modernist Self*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫

২৫ The Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty, trans. C. Smith, Humanities Press, London, 1962, p ix

২৬ ভূমিকা, আল মাহমুদ, *আল মাহমুদের কবিতা*, হরফ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ.৫

২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৫-৬

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৬

২৯ ভূমিকা, সৈয়দ শামসুল হক, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ ৫

৩০ What is Writing?, Writing Degree Zero, *Barthes: Selected Writings*, Susan Sontag (edt.), Fontana/Collins, Oxford, 1981, P.59-61

২১ ভূমিকা, সৈয়দ শামসুল হক, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, *বিদ্যাপ্রকাশ*, ঢাকা, পৃ ৫

৩২ *The Modernist Self*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৭